তৃতীয় মাত্রা

পর্ব-৬৫০৫

উপস্থাপনা: জিল্লুর রাহমান

আলোচক: মোহাম্মদ হাতেম, বিকেএমইএ-এর ১ম সহ-সভাপতি ও ইএবি'র সিনিয়র সহ-সভাপতি,

তৌফিকুল ইসলাম খান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো

তারিখ: ২৪.০৫.২০২১

জিল্লুর রাহমানঃ বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে channel-i দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। পৃথক আতঙ্কে এখনো গোটা বিশ্ব। বাংলাদেশ তার বাইরে নয়। ইতিমধ্যেই প্রায় তৃতীয় ঢেউয়ের সূচনাপর্ব বাংলাদেশ অতিক্রম করেছে। ঈদের পরে এবং লকডাউন চলাকালীন সময়ে পরিস্থিতিটা আসলে কতটা খারাপ হবে সেটি বোঝার জন্য আরো হয়তো খানিকটা সময় আমাদের অতিক্রম করতে হবে। যে আমরা আসলে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। সরকারের শুরু থেকেই একটা বিষয় চেষ্টা করেছে যে জীবন এবং জীবিকার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে। যদিও সেখানে নানা কিছু বিষয়

প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং কোভিড এর প্রথম দিক থেকে আমরা নানা অনিয়ম, নানা অব্যবস্থাপনা প্রস্তুতি দুর্বলতা, সেগুলো দেখে নানান জনের নানান বক্তব্য আমরা শুনেছি। বিশৃংখলা দুর্নীতি সেগুলো দেখেছে। বছরের শেষে ২০২০ এর শেষ নাগাদ সারা

বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এ বছরের মার্চে এসে পরিস্থিতি আবার খারাপ হতে থাকে। এখানেও গত বছর এই সময় যে সাধারণ ছুটি ছিল এবছর লকডাউন সেটিতে তারা কঠোর লকডাউনে থাকতে পারেনি। সরকার কঠোর লকডাউনের সিদ্ধান্তের স্থির থাকতে পারেনি।

সেখানেও দ্রুততার সঙ্গে সবকিছু খুলে দিতে হয়েছে এবং রমজান মাসকে কেন্দ্র করে দোকান পাট খুলতে হয়েছিল, গণপরিবহন কিছুদিন মাঝখানে বন্ধ থাকলেও কিছু সময় পর তা খুলতে বাধ্য হয়েছে। অন্তত আন্তঃনগর পরিবহন বন্ধ থাকলেও নগরের অভ্যন্তরে যেসব গণপরিবহন চলাচল করেছে সেগুলো খুলে দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র আমাদের জানা দরকার। আমরা জানি যে, এই সময়টাতে সরকারি যে হিসেব বাবা তথ্য-উপাত্ত সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মোটামুটি ভাবে বেশ ভালই এগিয়ে চলেছে। একসময় যেটি সরকারের দিক থেকে বলা হতো অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। কিন্তু সম্প্রতি আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশের নতুন দরিদ্রের সংখ্যা ২ লাখ ৪৫ হাজার নতুন করে যুক্ত হয়েছে। যা পার ক্যাপিটাল ইনকাম বা প্রবৃদ্ধি হিসেবে তার সঙ্গে আসলে মানানসই নয়। বর্তমানে

দরিদ্র মানুষ তাদের অবস্থা আসলেই খুবই সহজ নয়। সে কারণে অনেকের শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কোভিড পরিস্থিতিতে এই বাজেট আমরা কেমন চাই এই নিয়ে আলোচনা দরকার আছে। আমরা জানি যে, আমাদের এখানে জনস্বাস্থ্যে পৃথিবীর একেবারে সবচাইতে কম বাণিজ্যের দেশগুলোর মধ্যে থাকবে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেই আমাদের জনস্বাস্থ্যে অবস্থা অত্যন্ত কম।

আমরা যদি এই ব্যাপার বিবেচনা করতে চাই, কোভিড পরিস্থিতিতে ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ কম। আবার অন্যদিকে কেউ কেউ যুক্তি দিচ্ছেন বরাদ্দ দিয়ে লাভ কি তারা আসলে সেই অর্থটা ঠিক মতো ব্যয় করতে পারে না। তারপরও গত বছরের লক্ষ্য করেছে যে, স্বাস্থ্যখাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে কিন্তু সেই অর্থ মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারিনি। আগামী বাজেট জুন মাসের ৩ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করবেন অর্থমন্ত্রী এবং সেটি আসলে কেমন চাই কেমন হওয়া দরকার, কর কাঠামো নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আছে। আমাদের এখানে সংস্কারের কথা শুনে অনেক রকমের বক্তব্য আছে কিন্তু এগুলো কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে কাজে শেষ পর্যন্ত তেমনটা দেখা যায়না। বাজেট হয় কিন্তু বাজেট বাস্তবায়ন হয়না বাস্তবায়নের নানা রকমের চ্যালেঞ্জ এসব বিষয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে একজন ব্যবসায়ী নেতা রয়েছেন এবং একজন গবেষক রয়েছেন। বিকেএমইএ-এর ১ম সহ-সভাপতি ও ইএবি'র সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় আমন্ত্রণ।

প্রথমে আপনাদের বিশেষভাবে স্বাগতম। আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে বাংলাদেশের অর্থনীতির হালচাল গোটা বিশ্বকে একটা ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমরা শুনেছে যে সরকার অর্থনৈতিক গতিকে মোটামুটি সচল করার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে গার্মেন্ট সেক্টর তো প্রথম থেকেই খোলা বেশি। একইসঙ্গে আপনার আবার আপনাদের ফ্যাক্টরি গুলো চালু রেখেছেন। অনেক সময় বুঝতে পারিনি অর্ডার কেন আসছে না, ক্যানসেল হয়ে যাচ্ছে কিনা। অর্ডার না থাকলে ফ্যাক্টরি কেন চালু আছে। অনেক কিছু আমরা বুঝতে পারছি না তবে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

মোহাম্মদ হাতেম, বিকেএমইএ-এর ১ম সহ-সভাপতি ও ইএবির সিনিয়র সহ-সভাপতিঃ

প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে চাই প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি একটা সাহসী এবং সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। গতবছর গার্মেন্টস প্রথম এক মাস বন্ধ থাকার পরে এরপরই তিনি কিন্তু সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে উৎপাদন চলবে। উৎপাদনের টাকা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অর্থনীতির চাকা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেই প্রেক্ষিতে কিন্তু সিদ্ধান্ত হলো। আমরা কিন্তু এরপর থেকে দেখেন আপনারা যদি আপনাদের মনে থাকে যেন গত বছরের এপ্রিল মাসে রপ্তানি কিন্তু একেবারে তলানিতে নেমে গিয়েছিল এরপর যখন খুলে দেওয়া হলো আমরা কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম

এবং ওই সময়ে সরকার যে আমাদেরকে একটা প্রণোদনার ঋণসুবিধা দিয়েছিলেন শ্রমিকের বেতন দেওয়ার জন্য যেটা সরাসরি শ্রমিকের একাউন্টে গিয়েছে। আমাদের জন্য টিকে থাকার জন্য বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন যে রপ্তানির কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েছে। গত বছর দেখেন আমাদের এপ্রিল পর্যন্ত যেখানে ২৭ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি হয়েছিল তা ২৭.৯৪ এবং সেটা ছিল আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১৮ শতাংশ এর উপরে নেগেটিভ গ্রোথ ছিল। সেটা থেকে কিন্তু আমরা এখন এই বছর কিন্তু প্রথম ১০ মাসের হিসাব যদি দেখেন অলমোস্ট আমরা ২৬ বিলিয়ন ডলার কিন্তু অতিক্রম করেছে। ১০ মাস অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে কিন্তু আমরা এগিয়ে আছি কিন্তু এখন আমরা কিভাবে এগিয়ে আছি কিন্তু প্রশ্ন হল গত মাসে প্রায় ১৭ পার্সেন্ট এর মতো নেগেটিভ গ্রোথ ছিল কিন্তু নিটে পজিটিভ ছিল। এটা স্বাভাবিক ফর্মাল ড্রেসস কালীন সময়ে মানুষ পড়ছে না। অফিস-আদালত বন্ধ ঘরে বসে কাজ করছে। সে ক্ষেত্রে তারা ফরমাল ড্রেসের তুলনায় ক্যাসুয়াল ড্রেস বেশি ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিক্রিও হচ্ছে। যার কারণে রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু সেখানে লসের পরিমাণ বাড়ছে। রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে। আমাদেরকে বায়াররা আগের তুলনায় টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট প্রাইস ডাউন করে আমাদেরকে দিচ্ছে। এবং আমরাও নিতে বাধ্য হচ্ছি। টিকে থাকার জন্য সেই ক্ষেত্রে এখন আমরা যেমন আগে আমরা রিকোয়েস্ট করতাম ঠিক আছে। এখন আমরা ভাবি কোন প্রফিট করতে হবে না ওকে। আমরা দেখি যে কোন ভান্ডারে লস বা আমাদের নষ্টা কম হবে পরিমাণে সেইটা। আমরা সেটা দেখি। এই অবস্থায় কিন্তু আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রবৃত্তির আমরা বাড়াবার চেষ্টা করছি। তারপরও আমরা টিকে থাকার এই সময়টা যদি টিকে থাকতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা একটা সমাজে ঘুরে দাঁড়াবো। টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে।

জিল্লুর রাহমানঃ বর্তমান পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে যে দেশের অর্থনীতি চেহারাটা কি দেখানো সে বিষয়ে কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন না।

তৌফিকুল ইসলাম খানঃ বড় বিষয় হলো বিশ্বের মানচিত্রে কথা আমরা বলি সেই তুলনায় বাংলাদেশের সাথে তুলনা যোগ্য যে দেশগুলো আছে বা উন্নত বিশ্বেও যাদের আছে তাদের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো পর্যন্ত অনেক বেশি সংগত অবস্থান আছে। এতে কোন সন্দেহ নাই সন্দেহ নাই।

জিল্লুর রাহমানঃ সেটা কি কাগজ-কলমের হিসেব-নিকেশ?

তৌফিকুল ইসলাম খানঃ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের দেশে সংক্রমণ রোধে বেশ কিছুটা কম ছিল। গত এক বছরে এটা আমরা কোনো না কোনোভাবে এটাকে থেকে আমরা কিছুটা বেঁচে যায়। যত উন্নত বিশ্ব হবে যত যোগাযোগের ভিতরে ছিল যদি না তারা খুব কঠোর পদক্ষেপ না নেয় চীনের মত অস্ট্রেলিয়া,নিউজিল্যান্ড এর মত তাহলে আপনার এটাতো আপনার চলাচল যত মানুষের বেশি হবে মানুষের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে। সেই তুলনায় আমরা অনেক ভালো করেছি। এটা তো এটা আমাদের জন্য সুবিধা ছিল। বিশেষ করে ২০২০ সালের আর শেষ ভাগটা এবং এই বছরে

২০২১ সালের প্রথম দুই মাস পর্যন্ত মাঝামাঝি পর্যন্ত আপনি দেখবেন যে কমে যাচ্ছিল। এটা আমাদের একটা বড় বিষয়।

আর দ্বিতীয়ত, অন্তত আমাদের বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্রিক ভাবে ছিল। সেটার একটা প্রভাব ছিল। একটা প্রাথমিক ধাক্কার নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির ভিতরে চলে গেছে। বাংলাদেশের অবস্থান টা ভালো ছিল এতে কোন সন্দেহ নাই। বিতর্ক আছে কারণ হলো যে প্রবৃদ্ধি হিসাব প্রাথমিকভাবে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো গত বছর করেছিলেন তখন আমরা বলেছিলাম যে আসলে মার্চ-এপ্রিল মাসে হিসেবে নিয়েছেন। এটার প্রভাবটা সেই অর্থে আমাদের ওখানে ছিল মনে হচ্ছিল। আমাদের উপরে কিছুটা প্রভাব কতখানি ছিলনা। 5.2% একটা প্রবৃদ্ধি হবে সেটাকে আমরা করেছি। এপ্রিল মাসে এক্সপোর্টের যদি আমি সিনারিও দেখি, আমরা দেখেছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের ডাটাগুলো দেখেছি, আমরা দেখেছি যে কিভাবে ইনফর্মাল সেক্টর সার্ভিস সেক্টর গুলো কিভাবে পড়ে গেছে। সেইটা আমাদের শিবিরকে জড়ানোর বলেছেন যে দুই আড়াই শতাংশের বেশি হওয়ার কথা না সেটাও কিন্তু ভালো ছিল। আমাদের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি পাওয়াটা বড় বিষয় ছিল। এই তারপরে আমরা অবশ্যই যেতাম মুশকিল হলো সেটা আমরা পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে আর কোন মানে যেটাকে বলি আমরা বলি যে ফাইনাল স্টিমের চূড়ান্ত হিসাব পেলাম আমরা অনেক দিন থেকেই বলছিলাম যদি প্রান্তিক হিসাব পাওয়া যেত তাহলে বোঝা যায় যে উন্নতি হচ্ছে কি হয় নাই। এই অর্থবছর আমরা মনে করি না যে, একেবারে 7% ৮% গ্রোথ হবে কিন্তু ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হবে এটা আমরা জানি। কারন একটা বড় অংশের ভিতর আমরা ইতিবাচক জায়গায় ছিলাম। যেটা হয়েছে সেটা হল আমরা অনেক বেশি মাইক্রো লেভেলে রাখার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখার চেষ্টা করেছি এবং সেই জায়গাটা থেকে অনেকগুলো দেখবেন যে আপনারা আমরা যারা গবেষণা করছি এখানে জন্য ধন্যবাদ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম করেছি। গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের জন্য এখন কর্মসংস্থান এবং সাধারণ মানুষের কাছে কতটা জায়গা আছে।

জিডিপির যে হিসাবটা আমরা করি এটা আমি একটু পরিষ্কার করে বলতে পারি সাধারন মানুষের আমরা দেখে পরীক্ষা না পর্যায়ের আপনার- আমার আয় কত হচ্ছে। যেমন আছে তার সাথে কিন্তু কর্পোরেশনের কতখানি আয় হচ্ছে সরকারের কত আয় হচ্ছে । এ ধরনের বিভিন্ন এন্টিটি আছে যেটা বলি সেটা হাউজহোল্ড এর মাথাপিছু আয়। আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা যেটা দেখেছি সেটা আমাদের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৬০ শতাংশের মতো মানুষ কোনো না কোনো সময়ে কোভিডের কারনে গত এক বছরের ভেতরে আমরা প্রথম মার্চ থেকে এই বছর পর্যন্ত সেই সময় কোন না কোন সময় হয় চাকরি হারিয়েছেন। অথবা তাদের কাজে যেতে পারেননি অথবা তাদের আয় ছিল না। চাকরি আছে কিন্তু চাকরিতে বেতন হবে না এরকম হয়েছে।

অন্তত পক্ষে দু-তিন মাসের একটা পরিস্থিতির আছে। আবার তার পরে কিন্তু এপ্রিল মে জুন এর পর জুলাই এর পর থেকে ইম্প্রুভ করা শুরু করেছে। আগের বছরে ফেব্রুয়ারি তুলনায় তাদের যে মাথাপিছু আয় মাথাপিছু এটা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১২ শতাংশ কম আছে। তার মানে আমরা তখন বলছিলাম কিন্তু ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আমরা উত্তোলন করছি এই পরিস্থিতিটা।

তারপরে তো আবার একটা দ্বিতীয় লকডাউন এর ভিতরে খারাপ হচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে জায়গাটার ভেতর থেকে দু-তিন মাস যে তাদের কাজ ছিল না। প্রায় গড়পড়তা ভাবে তাদের কিন্তু টিকে থাকতে হয়েছে। এবং একটি কে থাকার জন্য তখন তারা খরচ কমিয়েছেন। অনেক লোক খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন তাদের যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যয় করতেন তারা সেই জায়গাটায় তারা সংযুক্ত হয়েছেন। এবং একই সাথে যেটা হয়েছে তারও চেয়ে কমেছে। প্রায় একটা বড় অংশের ৫০ শতাংশের উপরে তারা সঞ্চয় হারিয়েছে। মাথাপিছু ঋণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেইটা আমরা দেখেছি যে এই ধরনের মানুষের প্রায় দ্বিগুণ হয়। অর্থাৎ তারা যে পরিস্থিতির ভিতরে ছিলেন যেটা ব্যবসায়িক পর্যায়ে থাকার চেষ্টা করছেন। সাধারণ মানুষের পর্যায়ে থেকে যারা কর্মী আছেন চাকরি করতেছেন কাজ করছেন কিন্তু সেটা সেই কাজটা কতখানি মিনিংফুল কাজ সেটা আমি জানি যে আপনি আপনার শুরুতে বলছিলেন, যে অনেক মানুষ গ্রামে চলে গেছে। ওইটাই দেখেছি যে, আমাদের অনেক বেশি অংশই মানুষ গ্রামে ফিরে গেছে। কিন্তু তারা সেবাখাতের ভিতরে যতখানি ছিলেন সেখান থেকে তারা এখন কৃষি ভিত্তিক কাজের ভিতর ফিরে গেছেন। গড়পড়তা আগে একজন মানুষ যে পরিমান কাজ করতেন তার থেকে এখন প্রায় ৪,৫ শতাংশ কম আর ঘন্টা কাজ করছেন। আগে যখন মানুষ দুজন মিলেই করতে পারতেন সাধারণভাবে বেকারত্বের সংজ্ঞা টা ব্যবহার করি সেখানে আপনি গত সাত দিনে আপনি একঘন্টা কাজ করেছেন। আর কিছু না পেলে একটা কাপড় নিয়ে হয়তো সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা গাড়ি মুছে অথবা চকলেট বিক্রি করার চেষ্টা করছে। এখন যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা সাধারণ বেকারত্বের হার না দেখে আমাদের আসলে দেখতে হবে তার কর্মসংস্থান আছে কিনা তার আয়ের জায়গাটা ফেরত আসে কিনা। গার্মেন্টসে কাজ করেছেন আমি নিশ্চিত আগে হয়তো যে পরিমানের ওভারটাইম কাজ করলেও ওভারটাইম পাচ্ছেন না। কোন কোন জায়গা থেকে বলছেন যে আগে যেরকম মজুরি দিতেন এখন তা দেয়া হয়না। সবাই টিকে থাকার লড়াই করছে আমরাও টিকে থাকার লড়াই করছি। সেই পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েই আমরা বলছি যে, সামনের বছরের বাজেট নিয়ে চিন্তা করি তাহলে এটা ঠিক প্রবৃদ্ধি আসবে। বিনিয়োগ আসবে। যাতে দু'বছর আগে আমরা বলতাম ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। মানুষগুলোকে আগামী হয়তো আরো এক দুই বছর এই পরিস্থিতিতে চলবে। আমাদের কাছে তো মনে হচ্ছে হয়তো এই পর্যন্ত সাধারণ সব মানুষের কাছে শুধু আমার দেশ না সারা বিশ্বে সবার কাছে ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবল না হবে ততদিন পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলবে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে থাকার একটা ঝুঁকি রয়েছে। সেই জায়গাতে আমার এখন মনোযোগ দেখাই নাই বেশি। গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কিভাবে আগামী ১ ২ বছর সংহত অবস্থায় টিকে থাকতে পারব।

জিল্লুর রাহমানঃ তারমানে আমরা বলতে পারছি আগামী বাজেট হবে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রীয় বাজেট। যেখানে আপনি মানুষ বাঁচানোর প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ' দিতে হবে। দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে শুনতে চাই।

মোহাম্মদ হাতেমঃ প্রথম পর্যায়ের বিনিয়োগের সঙ্গে সরকারই দেখতে তো প্রথম প্রণোদনা ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনাদের কে টার্গেট করে এবং তার পরেও প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। সেই প্রণোদনা আসলে কতটা এ খাতকে সচল সক্রিয় রাখতে সহায়তা ছিল বিশেষ করে যেটা আমি

বারবার উল্লেখ করছি দেশের শ্রমজীবী মানুষ যারা শ্রমিক তাদেরকে সরকার প্রণোদনা সরাসরি শ্রমিকের একাউন্টে কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে। এবং সেই অবস্থা থেকে কিন্তু আমরা এখনো কিন্তু শ্রমিকদেরকে নিয়ে টিকে আছি এবং নিজে আলোচনা একটা কথা বলছিলেন যে মজুরিতে হয়েছে। আমি অন্তত চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি একমাত্র গার্মেন্টস খাতে মুজুরি কমাবার কোন সুযোগ নেই। আবার মজুরি কম আবার কোন সুযোগ আমাদের এখানে নেই। বরং সারা বিশ্বে যেখানে মজুরি কমিয়েছে কর্মী ছাঁটাই হয়েছে এই সময় কিন্তু আমাদেরকে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট সেটাও কিন্তু আমাদেরকে দিতে হবে যদি আমরা সরকারের।

যদিও আমরা সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম যে এই অন্তত বছরে যে ইনক্রিমেন্ট যেটি করোনা কালীন সময়ের জন্য বন্ধ রাখার জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আমরা সারা পাইনি। দ্বিতীয়ত বলছিলাম কেমন বাজেট চাই। সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে আন্তরিকতার কোন অভাব থাকে না। বিশেষ করে এক্সপোর্ট সেক্টরকে গতিবেগ বাড়ানোর জন্য গতি বাড়ানোর জন্য সরকার সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া চেষ্টা করছে। কিন্তু ইম্প্লেমেন্টেশন লেভেলে গিয়া এটা কিন্তু বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত হয় এবং সরকারকে কখনো কখনো ভুল বুঝিয়েন ভুল তথ্য দিয়ে কিছু কোথাও কোথাও কিছু প্যাচ লাগানো থাকে যেটা আসলে পরবর্তীতে গিয়া আমাদের এই আমদানি রপ্তানিতা ব্যাহত হয়। যেমন আমি যদি আপনাদেরকে বলতে পারি, আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরে আমরা ইনকাম ট্যাক্স অ্যাডভান্স দেই। যেটা আমাদের ৫ শতাংশ করে কেটে নেওয়া হয়। আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের যেটা একটা বদনাম সবসময় আছে যে আমরা ট্যাক্স ফাকি দেই। আমরা অর্থমন্ত্রীকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম তাহলে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কোনও কারো সুযোগ থাকবেনা। আর দ্বিতীয়তঃ হলো আগের তুলনায় এইটা যদি নেন তাহলে কয়েক গুণ বেশি ট্যাক্স কিন্তু গার্মেন্ট খাত থেকে পাবেন। উনারা হিসাব-নিকাশ করে দেখলেন এটা সঠিক যেটা চালু করবে। আমাদের এখান থেকে ফাইনাল সেটেলমেন্ট ছিল যাতে করে ওই যে বিষয়টি আবার ডিসিডি বা বিভিন্নভাবে চাপে ফেলে বা হয়রানি শিকার হতে হয় অথবা দুর্নীতি কোথাও কোথাও কেউ কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত হয় সেটা থেকে অন্তত আমরা রক্ষা পাবো। এবং সেটা ফাইনাল চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিন কিন্তু প্রচলিত ছিল। হঠাৎ করে কি কারনে, কি বুঝায় এটা গত দুই বছর ধরে গেল এটা আমাদের কাছ থেকে সরে গেল সটি আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। তাহলে যারা এই অ্যাসেসমেন্ট এর দায়িত্ব আবার তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন তারমানে দুর্নীতি গ্রস্থ হওয়ার একটা সুযোগ তৈরি করে দিলেন । আর দ্বিতীয়তঃ আমরা যারা ট্যাক্স পেয়ার আমাদেরকে আরো চাপে ফেলার একটা সুযোগ কিন্তু এখানে তৈরি করে দেয়া হলো। আবারও বলছি যে আমাদের ট্যাক্স যাই হোক এটাই ফাইনাল স্যাটেলমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা হবে। দুই নম্বর হল, নগদ সহায়তা সরকার দিয়ে থাকেন। দেশিও সুতা ব্যবহার এর বিপরীতে আজকে বাংলাদেশ বাংলাদেশের কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারণ আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিতে পাঁচ শতাধিক স্পিনিং মিল আছে। যারা আমাদের ৮৫%-৯০% আমাদেরকে ফিডব্যাক দিচ্ছে। অন্যান্য খাতে হিউজ ইনভেসমেন্ট পাচ্ছে যার ফলে আমরা কিন্তু আমাদের ভ্যালিডেশন মোর দেন ৮০%। দেশীয় সুতাকে কম দামে চীনে আমরা রপ্তানি করি যেমন ইন্ডিয়া থেকে তিন ডলার পার কেজিতে আনি কিন্তু এখান থেকে

আমরা মিনিমাম সাড়ে তিন ডলারে আনি। এই যে ৫০ ৬০ সেন্ট আমরা বেশি দেই এটাকে সমন্বয় করার জন্য আমরা ভর্তুকি হিসেবে পরবর্তীতে রপ্তানি করে আমরা রপ্তানি করি। অন্যান্য দেশের তুলনায় এটাকে সম্পন্ন করার জন্য ভর্তুকি তবে পরবর্তীতে রপ্তানির পরে সরকার আমাদেরকে তাদের যেটা আমরা রপ্তানি করার পর ৬ মাস থেকে ১ বছর পরে আমরা পেয়ে থাকি এবং যেটা পেতেও আমাদের অনেক অনেক রকমের হয়রানির শিকার হতে হয়। আমরা এই এক দুই বছর পরে যখন ইন্সেন্টিভ পায় তখন সেখানে প্রতি একবছরে ট্যাক্স কেটে নেওয়া কষ্ট লাগে কারণ আমাদের এই টাকা দিয়ে আমাদের বিভিন্ন রকমের দেনা পাওনা পরিশোধ করতে হয়। আবেদন করেছেন প্রত্যাহার করা হোক। অথবা অন্য আগে যেতে পারছেন না হয়তো সেখানে অন্তত না থাকোক। ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানির ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিন যাবত বিজেপির প্রত্যয়ন পত্র নিয়ে ওয়ান পার্সেন্ট ডিউটিতে আমরা ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি করি সেখানে হঠাৎ করে কি কারণে গত বছর এটাকে বিকেবিবিডি প্রত্যায়নপত্র রহিত করে দিয়। বিভাগীয় ভ্যাট দপ্তরের কাছেই প্রত্যয়ন পত্র দেওয়ার বিধান করে দেয়া হল। তার মানে বুঝতেই পারছেন প্রত্যয়ন পত্র নেওয়া এটা কত কঠিন কাজ হচ্ছে। ক্যাপিটাল মেশিনের আমদানি নিরুৎসাহিত হয়েছে।আমার কথা হচ্ছে বিধান থাকা উচিত কারণ ক্যাপিটাল মেশিনারি যে কেউ আনুক কিন্তু এতে কোনরকম প্রত্যয়ন পত্র বিধান থাকা উচিত না। ক্যাপিটাল মেশিনের যত আসবে সেটি কিন্তু আরেক দেশে রপ্তানি হয়ে যাবে না সুতরাং এটা আসলে এখানে ইনস্টল হবে এবং উৎপাদন হবে ।উৎপাদিত পণ্য লোকাল কনজামশন মিট করে, দেশীয় বাজারে বিক্রি হলে তাহলে সেখানে সরকার ট্যাক্স পাবে। আর যদি রপ্তানি হয় তাহলে দুটোই সরকারের জন্য লাভ। সেখানে ফায়দা সরকারের হচ্ছে আমাদের কাছে টাকা কাটার মেশিন আমদানি কমে যাচ্ছে অর্থনীতির তারকাটা গতিপথ হয়ে যাচ্ছে।

আমদানির ক্ষেত্রে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে ওয়ান পার্সেন্ট ডিউটিতে যে কেউ মেশিন আনুক। দেশ উপকৃত হবে দেশের অর্থনীতি আরো উপকৃত হবে। ভ্যাট নিয়ে আমরা বহুবার আগেও কথা বলেছি। যে এক্সপোর্ট-ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি হান্ডেট পার্সেন্ট ভ্যাট মুক্ত বলা হচ্ছে। তারপরও কিন্তু এবং এই গ্রুপে আমাদের একটা মান্থলি রিটার্ন দাখিল করার বিধান করা হয়েছে। এই রিটার্ন দাখিল করার কোন কারন নেই। সরকারের জিরো ভ্যাটের রিটার্ন দাখিল করতে গিয়ে আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার দুই তিনটা লোকবল রাখতে হয় প্রতিমাসে এগুলি সব কম্পাইল করে সাবমিট করার জন্য এরপর আবার ভেতরে বিভিন্ন রকমের সমস্যা তো থাকেই। আমাদেরকে কেন যতবারই বলি এর মধ্যে পড়তে হয়। আমাদের কাছে ভোট গণনার একটি হিসাব সরকারের অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে থাকছে। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট আমার প্রতি বছর হিসাব নিকাশ সব বুঝিয়ে দিতে হয় সুতরাং বাংলাদেশ ব্যাংক ও বন্ড কমিশনারের একটি হিসাব থাকছে। রপ্তানি আমদানি ক্ষেত্রে কাস্টমসের আরেকটা শাখা থাকছে কিন্তু সেখানে এই হিসাবের এই যুক্তিটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আবার রপ্তানিমুখী শিল্প ভ্যাটমুক্ত কিন্তু কিছু কিছু কাঁচা মাংস খেতে আমাদেরকে ভর্তুকি কেন দিতে হয়। আমরা আবেদন করেছি এই সমস্ত প্রকার কারণ যেহেতু আমার রপ্তানির জন্যই তো

আমরা এটা ক্রয় করছি তাহলে সেটাকে কেন এর মধ্যে রাখতে হবে। এটাকে কখনো কখনো দেখা যায় আপনি যদি দেখেন ওই ঐদিকে শরীফ মেলামাইন একটা জায়গা আছে ওখানে গাড়িকে আটকায়ে রেখে দেয়। বিভিন্ন মালামাল আমরা ফ্যাক্টরি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেই ওইটাকে কথা আটকে রাখা হয়। ফায়ার সেক্টর ইকুইপমেন্ট ২০১৩ সালে তাজরিন ও রানা প্লাজা ঘটনার পর সরকার সকল হয়। ফায়ার সেক্টর ইকুইপমেন্টর আমদানি ডিউটি ফ্রি করে দিল। এক বছর পর দেখা গেল সেখানে ৫% ডিউটি ইম্পসে করে দেয়া হল। কিন্তু কার বুদ্ধিতে এনবিআর তখন ওখানে একটু লেজ লাগাইয়া দিল যে একটা প্রতিষ্ঠান একবারের বেশি ইকুপমেন্ট করতে পারবে না। আমি আজকে একটা ফ্যাক্টরি দুতালা পর্যন্ত করলাম দু বছর পর আমি একে চার তালা করবো। এতে আবার আমার ফায়ার সেফটি ইকুপমেন্ট আনতে হবে কিন্তু এটি আনতে দেয়া হবে না। আমি আজকে দুই বছর তিন বছর পরে কিন্তু আজকের এই ইউএন সার্টিফাইড যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর দায়-দায়িত্ব কিন্তু ইউএন নিচ্ছে না সরকার নিচ্ছে না কিন্তু আমরা সাফার করছি। সরকার আমার সেকেন্ড টাইম আমাকে আনতে দিচ্ছেন না কি তাহলে কি আমি কন্টিনিউ করব না একটু আগে কন্ট্রোল করতে হবে এগুলোর কি যুক্তি আমাদের কাছে নেই। আরেকটা আবেদন করেছি শ্রমিকদের জন্য এই পরিস্থিতিতে রেশনিং ব্যবস্থা করছি অন্তত এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা কম মূল্যের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিতে পারে এই ধরনের একটা ব্যবস্থা সরকারের বাজেটও রাখা হয়। আরেকটা জিনিস পত্র-পত্রিকা আসে এইচএস ফুডের জটিলতা। এইচএস ফুড টেস্ট করতে পাঠানো হয়। মালটা ছেড়ে দিয়ে আপনি ট্রাস্ট করতে পারেন কোন অসুবিধা না এই মাল এক মাস দেড় মাস দুই মাস আটকে রেখে টেস্ট করতে পাঠানো হয়। এতে রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে। দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হছে।

জিল্লুর রাহমানঃ বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিস্থিতি খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কোভিডের কারণে বিনিয়োগ পরিস্থিতি খুব একটা স্বস্তিকর নয় এবং বিনিয়োগ না হলে কর্মসংস্থান হয়না। বিনিয়োগ কর্মসংস্থান মিলিয়ে যে হিসাব দেখানো হয় সেটি আসলে মেলে না। এটি ণীয়ে শুনতে চাই। একই সাথে পোশাক খাতের উপর সরকার অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় এটি অন্যান্য সেক্টরে যারা কাজ করে তাদের প্রতি অবিচার মনে করেন।

তৌফিকুল ইসলাম খানঃ এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে যেটা আমি সবসময় বলি সেটা হলো, এই খাতের উদ্যোক্তারা যতখানি একত্রিতভাবে কাজ করে সেটি অবশ্যই ইতিবাচকভাবেই বলছি। নিঃসন্দেহে এটি সত্যি কথা কারণ আপনি যদি রফতানি খাতের কথা দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে ৮৫% উপরে ওপেন আছে এবং অন্যান্য আরো সংশ্লিষ্ট খাতগুলোর চেয়ে নিঃসন্দেহে এই খাতটি আমাদের দেশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি একক বৃহত্তম রপ্তানি খাত এবং এ কারণে এটি গুরুত্বটা বেশি। যেটি আমরা বড় বিষয় দেখছে আমরা মনে করছি এই খাতের উদ্যোক্তারা একত্রিতভাবে যেভাবে নিজেদের কথাগুলো বলেন সেটি কিন্তু খুবই অনুপস্থিত অন্যদের ক্ষেত্রে। অন্য খাতে এটি অবশ্য একটি ইতিবাচক। গার্মেন্টস খাতে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা পরবর্তী পর্যায়ে গার্মেন্টস খাতে অনেক মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন অনেকভাবে। অনেকে রাজনৈতিকভাবে এখনও যুক্ত আছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের

থেকে আমরা অনেক রাজনীতিবিদ ও পেয়েছি সুতরাং তাদের একটা পৌঁছানোর ক্ষমতা আছে যা অন্যান্য খাতের মধ্যে নেই। তবে একই সাথে এই জায়গাটা তো আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। তবে এখানে গার্মেন্টস খাত কে কমিয়ে না এনে অন্যান্য খাতের অবস্থাটা বাড়াতে হবে। সুতরাং আমরা গার্মেন্টসের রপ্তানি কমিয়ে নয়। আমরা চাই গার্মেন্টস আমরা চাই গার্মেন্টস খাতের পাশাপাশি সেইগুলার উন্নতি হোক।

নব্বই শতকের ইন্ডাস্ট্রির কথা আমারা যদি দেখি আমরা দেখতে পারবো, লেদার ইন্ডাস্ট্রির অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমরা গেলাম। সেটা পরে যাবার পেছনে ব্যবসায় পর্যায় থেকে শুরু প্রত্যেকের দায়ভার আছে। এই ধরনের প্রতিঘাত কি গার্মেন্টস খাতের উপর আসে নাই? আমরা যদি দেখি নব্বইয়ের দশকের দিকে শিশুশ্রম, সম্প্রতি সময়ে আমরা তাজনিন, রানা প্লাজার মাধ্যমে দেখতে পারি যে এত বড় ঘটনার পরও সবাই তো মালিক-শ্রমিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা এটা প্রতিহত করার জন্য একত্রিত হয়ে কাজ করেছে। নানা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে গেছে। এই ধরনের কৌশলগত অবস্থান গুলো অন্যান্য খাতের জন্য আসেনি। গার্মেন্ট খাতের অনেকগুলো অভিযোগ মালিকপক্ষ-শ্রমিক ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া সবাই মিলে একত্রে প্রতিহত করেনি করেছে। কিন্তু আমরা গত ৩০ থেকে ৪০ বছরে যদি দেখি তাহলে গার্মেন্টস খাতে প্রণোদনা যত দেয়া হয়েছে সেটি অন্যান্য খাতে কখনো পাননি। এমনকি এই গার্মেন্টস খাতে যতখানি উন্নতি হয়েছে সেটি অন্যান্য খাতে কখনোই হয়নি। তো আমি এটা মনে করি গার্মেন্টস খাতকে অবহেলা না করে অন্যান্য খাতে গুরুত্ব দিয়ে সেই কাজগুলো উন্নতি করার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, বিনিয়োগের কথা যদি আমরা বলি, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা একই কথাই বলবো সেটি হচ্ছে এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেই পরিস্থিতিতে নতুন করে যে বড় বিনিয়োগ হবে সেটা আশা করাটা সঠিক হবে না। কারন সত্যিকার অর্থে সবাই টিকে থাকার চেষ্টা করছে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ এর সার্বিক অবস্থা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ জিডিপির অনুপাতে একটা স্থির জায়গায় ছিল। তবে বিনিয়োগ খাতে যে সমস্যা গুলো আছে সেগুলো উন্নত করার জন্য যে সংস্কার কাজ গুলো আছে সেটি কোভিড কালে বসে থাকার কোনো কারণ নেই। ওয়ান স্টপ সার্ভিস নাম্বার চেক করার জন্য কি করতে হবে, অটোমেশনের জন্য আমার কি করতে হবে, আমাদের যে এগুলোর জন্য সরকারি বিভিন্ন সংস্থা গুলোর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে লাইসেন্স নিতে হবে কেন। এই জায়গা গুলো থেকে কাজ করার জন্য কোভিড কি আপনাকে আটকে রাখবে। আমরা এই জায়গাগুলো কাজ করছি না কেন? এই জায়গাগুলো উন্নতি করা সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি প্রত্যেকটা ক্রাইসিস একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে নিয়ে আসে। আমরা সবাই বলছি যে, আগামী ২৩ বছরের মধ্যে পরিস্থিতি অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াবে। তবে এই সময়টা যদি আমরা প্রস্তুতিটা না রাখি, তৈরি না করি তাহলে সে অপরচুনিটি তৈরি হওয়ার জায়গাটা পড়ে যাবে। অপরচুনিটি গুলো তৈরি করে রাখতে পারি তাহলে ক্রাইসিস আসলেও আমাদের জন্য কিছু অপরচুনিটি নিয়ে আসবে। এই সুযোগগুলো হচ্ছে আমাদের সংস্থার কার্যকলাপ গুলোতে এখন থেকেই কাজ করতে পারি। তবে তা আমরা যদি অর্থনৈতিক ইতিহাস জানে তাহলে দেখব ১৯৩০ সালে কথা আমরা যদি

ধরি, সেইসময় যে বিনিয়োগ করে এবং ব্যয় করেছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে ইউরোপ এবং আমেরিকার মতো উন্নত দেশে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে ৪০ থেকে ৪৫ বছরের জন্য তার ওপর ভিত্তি করেই এসব সবকিছু হয়েছে। সেই জায়গাটাতে আসার চিন্তা করতে হবে। যতই বলি যে কোভিড কিন্তু আসলেই কি সত্যিকার অর্থে সেগুলো এত পিছিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই।

জিল্লুর রহমানঃ এর কারন কি ব্যয় বাড়ছে?

তৌফিকুল ইসলাম খানঃ না ব্যয় বাড়ছে। কাজের মানের ফলাফল খারাপ হচ্ছে। এটার প্রয়োজন নাই। এটা এক ধরনের মানসিকতার ব্যাপার। দেখতে হবে যে, আমরা এই জায়গাগুলো কি বাড়াতে পারি কিনা। অর্থনীতিতে আমরা দুটো জিনিস বলছি, একটা হচ্ছে সংকট নিরসন মানে মানুষকে টিকিয়ে রাখতে হবে এবং আরেকটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের জায়গাটাতে আমরা যদি তাদেরকে আরো বেশি জোরদার করতে পারি এটি গুরুত্বপূর্ণ। ভ্যাকসিন লাগবে, চিকিৎসা লাগবে, এই জায়গাটা যেরকম ঠিক রাখতে হবে আর মানুষকে টিকিয়ে রাখার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষি নিরাপত্তা, কৃষিতে মনোযোগ-যেমন ছোট উদ্যোক্তা তারা যেন টিকে থাকতে পারে সেই বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে। যেরকম বড় উদ্যোক্তারা অনেক কিছু বলতে পারে কারণ অনেকের সাথে লিংক আছে কিন্তু ছোট উদ্যোক্তারা তো আসলে খুঁজে পান না তাদের সমস্যাগুলো কাকে বলবে। তারা এই পরিস্থিতিতে তাদের সমস্যাগুলো কাকে বলে সেগুলো আসলে তারা বুঝতে পাননা। তাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। ব্যাংকগুলোর ঋণ তাদেরকে দিতে চায় না যারা ৪0 বছর ধরে ব্যবসা করেছে হাতিম ভাইদের মতো তাদের ঋণ দিতে চায়। কিন্তু তাদের কি হবে এজন্য নতুন উদ্যোক্তা যারা কাজ করতে চায়? সেই কাজ করার জন্য তাদেরকে সুযোগ করে দিতে হবে। আমরা যদি দেখি, আশির দশকে গার্মেন্টসে যারা কাজ করে আসছেন তারা একটা বড় এমাউন্টের লোকজন এখন তারা গার্মেন্টসের নেতা। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যারা কিছুদিন গার্মেন্টসে কাজ করেছেন তারপর এমডি হয়েছেন এরকম প্রচুর হিস্ট্রি আছে। তখন যদি আমরা চিন্তা করতাম ঝুঁকি আছে তাদের ব্যবসা লস হতে পারে তাহলে আমি নিশ্চিত যে, আজকের ২৬ লক্ষ 24 লক্ষ মিলিয়নের বেশি ব্যবসায়ী আবিষ্কৃত হতো না। নতুন উদ্যোক্তা আবশ্যক সামনে এগিয়ে আনতে হবে। করোনার আগে ফান্ডামেন্টালিজম ব্যবহার করছি সেটি হল আপনার যদি নিজের ক্যাপিটাল থাকে তবেই আপনি বড় হন। এটি ঠিক নয়। একবছরের প্রণোদনা প্যাকেজের কথা আমরা যদি বলি তাহলে দেখব হাতেম ভাই আগামী মাসেরশে ২২ মার্চ মিটিং করেছিল। করোনাভাইরাস ধরার আগেই তাদের প্রণোদনা লাগবে এটি সরকারের কাছে আবেদন করেন। উনারা কিন্তু সবার আগে যোগাযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী সাথে। তারপর অন্যান্য খাতে যারা আছে তারা বেনিফিট নিল। উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা বরাদ্দের জন্য সার্কুলার দেয় এবং সেটি একমাস পরে সময় করে। তারপর একটা করে প্রবলেম হয় এবং সেটা চেঞ্জ হতে থাকে। প্রথমে বলেছে ইন্ডাস্ট্রি খাতে যাবে, এরপর সেবাখাত বলছে তাহলে আমাদের কি হবে, পরেরবার ট্রেডিং খাদ বলছে তাহলে আমরা কি করব। এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই অভিজ্ঞতাটা আমাদের ক্রাইসিস মোমেন্ট তাহলে সেই ক্রাইসিস মোমেন্ট এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশে অবশ্য একটা মজার বিষয় আছে অর্থনৈতিক নীতি টা কি হবে সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা ঐক্যবদ্ধ

আছে। ১৫ বছর আগেও এটা ছিল না বিশ্লেষকদের মতে। এখন প্রায় কোন দ্বিমত নেই। সবাই একইরকম কথা বলি। অর্থনীতিবিদরা বলে যে সম্প্রসারণ এর ক্ষেত্রে বাজেটটা বেশি ভাবতে হবে। ২০ বছর আগেও মানুষ স্প্রসারণ খাতের ক্ষেত্রে এতটাও বাজেটের কথা চিন্তা করতেন না। সমস্যাটা হলো আমরা যখন এগুলো বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছি তখন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর যে দুর্বলতা রয়েছে সেই দুর্বলতাগুলো বিবেচনা করেছি না। গত বছরের বাজেট যখন দেয়া হয় যেমন অর্থমন্ত্রণালয় যখন গতবছর বাজেট করেছিলেন দেখে মনে হলো যে, ১২ মাসের কথা চিন্তা করে নয় একটি সামার ভ্যাকেশনে কথা চিন্তা করে বাজেটটি কয়রা হয়েছে। কিন্তু আমরা সবাই তখন বলেছি যে এই ক্রাইসিস টা আসলে থাকবে বেশ কয়েক বছর। এই ক্রাইসিস রিকভারি তারাতারি চলে যাবে এটা আসলে ভাবার কোনো সুযোগ নেই। এই কনসেপ্টেটা ভুল। এইবারের আমরা মনে করি যে, এবারের বাজেটে সমস্যাকে প্রথমে স্বীকার করতে হবে। সেই অনুযায়ী রিকভারি তৈরি করতে হবে। অনেক সময় লাগবে সুতরাং এই এই রিকভারির জন্য একটি মধ্যমেয়াদি অ্যাপ্রচ থাকতে হবে। বলতে হবে যে, আমি আসলে কোন পর্যায়ে কোন ধরনের নীতি গুলো ব্যবহার করব এবং কি কি ধরনের ফলোআপ মেকানিজম করতে হবে। একবছরের বাজেট দিলাম সারা মাস ঘুমিয়ে উঠে আরেকটা খাতে ব্যয় বাজেটে বেশি দিলাম এটা আসলে কোন ভাবে কার্যকর নয়। প্রত্যেক দুই তিন মাস পরে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। যে ভ্যাকসিন এখনো আসছে, সেটা চলমান কিনা এবং আমি যে দুটো ভ্যাকসিন পেয়েছি সেটা আসলে মেয়াদকাল কত, এই জিনিসগুলো এখনও আনসার দিলে না সেই আনসার গুলো মাথায় রেখে আসলে বাজেট বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই সে নিজের ভেতর দুর্বলতা আছে সেই দুর্বলতা গুলো স্বীকার করে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। যদি না করি তাহলে এটা যে ফলাফলটা আমি চাচ্ছি সেই ফলাফল টা আপনি পাবেন না। আমরা জানি, সরকার এটা কখনোই চায়না যে গরিব মানুষগুলো রিকভারি না হোক কিন্তু সেই জিনিস গুলো আমরা কিভাবে এচিভ করব সেগুলো দিয়ে আমরা পলিসি মেক করতে হবে।

মোহাম্মদ হাতেমঃ আপনি অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন যেগুলো আমাদের ভাবা দরকার। সরকার প্রতিনিয়ত এক্সপোট ডাইভারসিফিকেশন নিয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন রকম ফ্যাসিলিটি সরকার দিচ্ছে। কিন্তু একসময় আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে দেশীয় সুতা ব্যবহার ছিল ২৫ পার্সেন্ট। সেটা কমতে কমতে এখন ৩ পার্সেন্টে এসেছে। আমরা মনে করি, গার্মেন্টস খাতে ৮৪ অথবা শেয়ার কেন থাকবে। অন্যান্য খাতগুলোকে তো অবশ্যই এগিয়ে আসা উচিত। এতে অন্যান্য খাতগুলো এগিয়ে যাবে। তাহলে রপ্তানি খাতটা ভালো হবে লাভবান হবে। আমরাও চাই যে অন্যান্য জাতিগুলো এগিয়ে আসুক। কিন্তু ওই ভাবে অন্যান্য খাতগুলো এগিয়ে আসতে পারছেন না। গত দুই বছরের কথা চিন্তা করি, সেই জায়গাটা যত বেশি ডাইভারসিফাইড হবে ততো ভালো;লএতে এক্সপোর্ট আরো বেশি লাভবান হবে। সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি যে আমাদের থেকে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি সরকারের রয়েছে অনুরোধ করব এই যে বিষয়গুলো তুলে ধরলাম এই জিনিস গুলো যেন এই বছর বাজেটে তারা অন্তর্ভুক্ত করে। এক্সপোর্ট সেক্টরটা আরও বেগবান হবে।করোনা কালীন সময় এই জায়গাটা যদি আরো উন্নত হয় তাহলে আমাদের জীবন টিকে থাকা

সহজ হবে। সহসা কোভিড চলে যাবে এটা ভাবার কোন সময় সুযোগ নেই। তাই এই করোনাকে মাথায় রেখে আমাদের আগামী দিনের বাজেট পরিকল্পনা করতে হবে এবং সাজাতে হবে। আগের যে পলিসি আছে বলে সেগুলো বাস্তবায়ন রাস্তাটা যেন সঠিক হয় সেটার দিকে গুরুত্ব রাখতে হবে। একই সাথে এই ধরনের জিনিস গুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেই প্রতিবন্ধকতাগুলো তৈরি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এইভাবে বাঁচলে আমাদের জন্য অনেক ভাল হয়।

জিল্লুর রহমানঃ তবে একদম শেষের দিকে আপনার কাছে শুনতে চাই আর কি ধরনের চাওয়া আসলে আপনার এই বাজেটে রাখতে চাই?

তৌফিকুল ইসলাম খানঃ প্রথমত আমাদের বাজেটে সাধারণভাবে যে জায়গায় যে বরাদ্দ প্রয়োজন সেখানে বরাদ্দ দিতে হবে। দুইটা অভিযোগ রয়েছে কোথায় খরচ হবে, সেটা শুধু অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বনা ভেবে বরাদ্দ নিয়ে সব খাতকেই চিন্তা করতে হবে। যেমন- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ঠিক করে দিতে হবে যে আমি এই কারণে বরাদ্দ দিতে চাই এবং কাগজপত্র দিয়ে তা ঠিক করতে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে বাস্তবায়ন সক্ষমতা থাকতে হবে। অর্থমন্ত্রী বলতে পারেন যে, স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দিয়ে লাভ কি সেখানে তো খরচ করতে পারবে না। সুতরাং সেই জায়গাটা আমার মনে হয় দেখতে হবে যে বাস্তবায়ন সক্ষমতা আছে কিনা। একইসাথে গুরুত্বপূর্ণ যে বরাদ্দ দিলাম এবং বাস্তবায়ন খরচ করলাম কিন্তু যেখানে খরচ হয়েছে তা যদি সুশাসন না থাকে সেটা দিয়ে কি লাভ? যেমন- এই কাপটা যদি আমি এক কোটি টাকা দিয়ে কিনি কিন্তু এটার দাম হচ্ছে ২০০ টাকা। টাকার অংকে আপনি এক কোটি টাকা খরচ করেছেন কিন্তু আসলে আপনি সুবিধা পাচ্ছেন না এই জায়গাটা থেকে স্বাস্থ্য খাতে তাতে লাভ কি? যে ধরনের দুর্নীতির চিত্র আমরা দেখেছি, সেই চিত্র বিবেচনা করে শুধুমাত্র বাজেটের অংকটা আমরা শুধু টাকার অঙ্কে বিবেচনা না করে এটা গুণগতমান চিন্তা করতে হবে। বাজেট বাস্তবায়নে সুশাসন কিভাবে করা যায় এবং সেটাকে পরিবেশন করা যায় সেটি ভাবতে হবে। তাহলে এই বরাদ্দওটা আসল অবজেক্টিভ হয়তো আমরা বের করতে পারব। আরেকটা যেটা বলতে চাইছিলাম যে আমাকে সব সময় বড়দের কথা বলছি। অসুবিধার মধ্যে আছে যেহেতু অনেকে কিন্তু দিন শেষে যখন আপনি বাজেট বাস্তবায়ন করবেন তখন সেই সম্পদ সংগ্রহ সংগ্রহের দরকার হবে। দেশের সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কি বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে এই সম্পদ সমান ভাগ করতে চাই তাহলে কর ফাঁকির অধিদপ্তর একটা জায়গাতে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ নিজেই ধন অ্যাক্টিভিটি কমাতে চান সেই জায়গাতে কর আরোপ করেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে সর্বোচ্চ ধনীদের গতবছরের ছাড়া দেওয়া হয়েছে। এটির প্রয়োজন নেই এই সময়টাতে তাদের ছাড় দেয়ার কোনো মানে হয় না তাদেরকে ব্যবসায় ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এটি পুনঃ বিবেচনা করে আগের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হোক। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে করের আহরন হচ্ছে সবচেয়ে কম। আমরা যেই , চিত্রটি দেখি সেটি হল প্রবৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ বাংলাদেশ, নারীর ক্ষমতায়নেও সর্বোচ্চ কিন্তু আমরা করের হারের তুলনায় পৃথিবীতে সবচাইতে কম কর আহরণকরি। সেটা সর্বনিম্ন পর্যায় আছে। আমার স্বাস্থ্য খাতের শিক্ষাখাতে সামাজিক নিরাপত্তা

খাতে কর সবচেয়ে কম দেই সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। এখানে সংস্কারের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখনই তারা অনেকগুলো কর সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে কিন্তু এরমধ্যে ভ্যাটিং বাদে আমরা আদৌ কি কিছু বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। আর একটা বিষয় যে সেটি এখনই করতে হবে বিষয়টা এমন না। আপনারা আলোচনা করুন। সেটাকে বন্ধ করে রাখার কোন মানে আমি দেখিনা।

জিল্লুর রহমানঃ অনুষ্ঠানের শেষপ্রান্তে এসেছি। আপনি আমাদের লিখতে পারেন বা মতামত জানাতে পারেন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় পেইজের মাধ্যমে। তৃতীয় মাত্রার অনুষ্ঠানটি পাবেন একই সাথে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতে তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটি ডাউনলোড করুন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য দুজনকে অশেষ ধন্যবাদ। দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আসন্ন বাজেট নিয়ে। কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে। তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশ কোভিড পরিস্থিতিতে অনেক ভালো করেছে পরিস্থিতি মোকাবেলায় এবং আমার সাথে অনেকেই একমত। গোটা বিশ্ব জুড়ে এখন সবাই লড়াই করছে এই করোনাকে নিয়ে। করোনাকালীন টিকে থাকার বাজেট কেমন চাই তা নিয়ে দুজনে বলছেন। এখানে প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রিক বা কাগজ-কলমে হিসাবের যে বাজেট সেই বাজেট না করে মানুষ বাঁচানোর বাজেটটা আসলে খুব বেশি দরকার সেটি সবাই বলছেন। ধন্যবাদ সবাইকে।